Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-IV, July 2024, Page No.173-182
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় দার্শনিকতত্ত্ব

ডঃ টুসি ভট্টাচার্য্য
সহকারি অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজ, দক্ষিণ বারাসাত, পশ্চিমবঙ্গ,ভারত

Abstract:

Writer Bibhuti bhusan Bandyopadhya is one of the eminent personalities bengal has ever produced.Many places mentioned in his writings seem distinct to me. The distinctness and fundamental approach of his writings are really praiseworthy.He understood life it's sequence in a philosophical tune by binding all distinct parts of life into one whole. In this regard, it seems that the character of Apu in his writing is a result of his own inner consciousness. We witness a manifestation of Spiritual consciousness in Apu's life through nature and human relationship. The writer himself has also travelled the spiritual path of life. In Aparajita we see that Apu has dreamed of a spiritual life.Bibhutibhusan Bandhyopadhyay has discovered successfully the tune of greatness in the life of even ordinary persons. It can be said that he has tried to unveil the unified aspect of life amidst fragments of experience. In his novel Debjan it is found that he has searched for the way to integrate this mundane and supramundane world that lies beyond death. He has sketched his thoughts about entering the life after death and then returning back to this mundane life in this Novel. His philosophical Outlook is reflected in his Novel Icchamati. It is also evident that he has reached to the depth of vedanta as well. Again in his Chhader Pahar we hear the echo of Shvetasvetar Upanisad.

In this way, from his writings it is evident that Upanisad, Gita ,Vedanta- all these have great influence on the life of Bubhutibhusan Bandhyoapadhyay. This versatile writer had a great philosophical mentality.

Keywords: Writer Bibhuti bhusan Bandyopadhyay, Philosophical mentality, Spiritual consciousness, Upanisad, unified aspect.

মহান্ সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্ট রচনাগুলির বেশ কিছু স্থান আমার কাছে স্বতন্ত্র বলেই পরিগণিত হয়েছে। তিনি হয়ত কোন দার্শনিকতত্ত্বের পণ্ডিতসুলভ রচনা সৃষ্টি করেননি, কিন্তু তাঁর রচনার স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী যথেষ্ট প্রশংসিত। নিজস্ব বিশ্বাসের মৌলিক দৃষ্টিকোণ্ থেকে তিনি মানবজীবন ও প্রকৃত-জীবনের পরিবর্তনশীল প্রবাহকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই তিনি বলেছেন —

> "যে জগৎকে আমরা প্রতিদিনের কাজকর্ম্মে হাটে-ঘাটে হাতের কাছে পাইতেছি জীবন তাহা নয়, এই কর্ম্মব্যস্ত অগভীর একঘেঁয়ে জীবনের পিছনের একটি সুন্দর পরিপূর্ণ,

> আনন্দভরা, সৌম্যজীবন লুকানো আছে — সে এক শাশ্বত রহস্যভরা গহনগভীর জীবন — মন্দাকিনী, যাহার গতি কল্প হইতে কল্পান্তরে; দুঃখকে তাহা করিয়াছে অমৃতত্বের পাথেয়, অশ্রুকে করিয়াছে অনন্ত জীবনের উৎসধারা…"[১]

তবে তিনি জীবনের সমস্ত বিচ্ছিন্ন খণ্ড প্রকাশকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করেই জীবনের পারম্পর্যকে উচ্চতম দার্শনিক সুরে বুঝেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে হয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে যে বৃহৎ চেতনা ছিল তা তাঁর রচিত অপু চরিত্রের মধ্যে সমন্বয় লাভ করেছে। প্রকৃতি ও মানবসম্পর্কের মধ্যে দিয়ে অপুর জীবনে ক্রমশঃ আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায় বাস্তব অভিজ্ঞতার পথ পেরিয়ে এসে সে ক্রমশঃ জীবনের খণ্ডতা বা ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে এক অখণ্ড জীবনের স্বাদ পেয়েছে। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে দেখা যায় অপুর শিশুমন সহজাত intuition -কে আশ্রয় করে ক্রমশ জীবনের গভীরতর উপলব্ধির মধ্যে প্রবেশ করেছে। বাইরের কোন তুচ্ছ ঘটনার মধ্যে দিয়ে অপু তার শিশু মনের সহজ বিস্ময় থেকে বহুদূরের কিছু জানতে চেষ্টা করেছে। তিনি লিখেছেন —

> "… মনে হয় এরকম লতা পাতার মধুর গন্ধভরা দিনগুলি ইহার আগে কবে একবার যেন আসিয়াছিল, সে সব দিনের অনুভূত আনন্দের অস্পষ্ট স্মৃতি আসিয়া এই দিনগুলিকে ভবিষ্যতের কোন অনির্দিষ্ট আনন্দের আশায় ভরিয়া তোলে। মনে হয় যেন কিছু ঘটিবে, এ দিনগুলি বুঝি বৃথা যাবে না। …।"[২]

অপুর এই উপলব্ধির মধ্যে জীবনের গভীর ঈশারা লক্ষ্য করা যায়। জীবন ও জগতের এই আধ্যাত্মিক পথে বিভূতিভূষণ নিজেও যাত্রা করেছিলেন। তাই 'অপরাজিত' উপন্যাসটিতেও দেখা যায় বৃহত্তর জীবনের স্বপ্ন অপু দেখেছে। "…এই সবটা লইয়া যে আসল বৃহত্তর জীবন, পৃথিবীর জীবনটুকু যার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র??"[৩] আমরা জীবন বলতে সাধারণতঃ আমাদের ধরা ছোঁয়ার মধ্যে যে দৈনন্দিন জীবন তাকে বুঝি ও বুঝিয়ে থাকি। কিন্তু সমগ্র জীবন তা নয়। তাই বিভূতিভূষণ কল্যাণী দেবীকে ২৪.১১.১৯৪০-এ এক পথে লিখেছিলেন — "সে বিরাট vision দিয়ে জীবনকে যে দেখেচে, জীবনকে সে সত্যকার চিনেচে।"[৪] অর্থাৎ তিনি জীবনকে সমগ্ররূপেই দেখেছিলেন, শুধুমাত্র এ পৃথিবীতে ক্ষণিকের জীবনকেই মেনে নেননি। তাই কাজল হয়ে ফিরে এসেছে অপু। সামান্য মানুষের জীবনযাত্রার ছন্দে আবিষ্কার করেছেন অসাম্য মহাজীবনের সুর। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন জীবনের গতি কখনো থামে না। মহাকালের বিরাট প্রেক্ষাপটে মহাজীবনের এই প্রবাহমান স্বরূপ তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। যাকে তিনি 'Life force' বলে স্বীকার করেছিলেন, 'অপরাজিত জীবনরহস্য' বলে উল্লেখ করেছিলেন। যে 'পথের দেবতা' অপুকে নিশ্চিন্দপুর ছাড়িয়ে দেশান্তরের পথে বার করেছিলেন, সেই 'পথের দেবতা' অপুকে কাজল করে নিশ্চিন্দপুরে ফেরত দিয়েছেন। এইভাবেই বৃহত্তর জীবনবোধের মধ্যে দিয়ে তাঁর উপন্যাসের সম্পূর্ণতা ঘটেছে। এই আলোচনা প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য্যের কথা মনে হয়। তিনি ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তার কথা স্বীকার করেছিলেন এবং আমাদের জগতের ভ্রম হয় একথা বলেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আমরা সব বস্তুকে খণ্ড খণ্ড বলে মনে করে থাকি। এই খণ্ড খণ্ড রূপে বস্তুর যে আবির্ভাব তা ভানমাত্র বা appearance, বাস্তব বা real নয়। তাই শঙ্করাচার্য্য এক অনন্ত সৎ, অপরিণামী পূর্ণ সত্তারূপ অনন্ত ব্রহ্মের অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন। আবার Bradley-র কথাও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়, যে তিনি তাঁর *Appearance and Reality* নামক গ্রন্থেও বলেছেন

appearance-এর অস্তিত্ব কিভাবে সম্ভব হয় তা আমরা জানি না। বিশ্ব কিরূপে এবং কেন আছে এবং কেনই বা সসীম বস্তু তার মধ্যে আছে তা ব্যাখ্যা করা সম্পূর্ণ অবাস্তব। সমগ্রের অংশ মানববুদ্ধির পক্ষে সমগ্রের জ্ঞান অসম্ভব। তাই দেখা যায় অদ্বৈত বেদান্ত মত হোক্ বা Bradley -ই হোন না কেন সব মতেই অখণ্ডরূপে সৎ-এর অস্তিত্ব আছে। আমাদের খণ্ড খণ্ড অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে বিভূতিভূষণও এইরকমই এক অখণ্ড জীবনের সন্ধান পেয়েছিলেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দেবযান' উপন্যাসে দেখতে পাওয়া যায় মৃত্যুর ওপারের জগতে কি আছে, এই জগৎ ও মৃত্যুপারের জগতের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটানো সম্ভব কিনা তারই উত্তর তিনি খুঁজেছেন। এই উপন্যাসের প্রথম দিকেই বিভূতিভূষণ লিখেছেন,

> "যতীন হঠাৎ দেখতে পেল তার খাটের পাশে পুষ্প দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে... কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল পুষ্প তো নেই। সে তো বহুকাল মরে গিয়েছে... পুষ্প খিল খিল করে হেসে উঠে বল্লে — মরে গিয়েচি, কিন্তু তুমিও যে মরে গিয়েচ যতুদা? নইলে তোমার আমার দেখা হবে কেমন করে?[৫]

অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে যে যতীন মারা যাওয়ার পর, পুষ্প, যে বহু আগে মারা গিয়েছিল সে তাকে পরলোকে নিয়ে যেতে এসেছে। আবার লিখেছেন "এসব লোকেদের এখনও কতবার পৃথিবীতে জন্মাতে হবে তবে এরা উচ্চস্তরের উপযুক্ত হবে।"[৬] এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে বার বার জন্মগ্রহণের ফলে আত্মা পরলোকের উচ্চস্তরে পৌঁছতে পারে একথাই বলতে চাওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যুর পর পরলোকে যাওয়া, পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসা, আবার অন্য কোন লোকে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে যে বিভূতিভূষণ চিন্তা ভাবনা করতেন তা এই উপন্যাস থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়। কারণ তিনি এইভাবে বিভিন্ন লোকের কথা এই উপন্যাসে বলেছেন। ভারতীয় দর্শনের বহুস্থানেও তেমন লক্ষ্য করা যায়। বিভূতিভূষণের যে তার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল তা অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লেখা তাঁর একটি চিঠি থেকেই বোঝা যায়। তিনি লিখেছেন,

> "প্রেতলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কিছু নেই। পৃথিবীর ঊর্ধ্বে বহুস্তর বিদ্যমান, বিশ্বে বহু লোক বহু স্তর, বহু গ্রহ, মৃত্যুর পর সেখানে জীবের গতি হয়। এইসব Supermundane worlds আছে এবং ঋষিরা প্রাচীন যুগে তাদের অস্তিত্ব জেনেছিলেন। বৃহদারণ্যক ও ঈশোপনিষদে এদের কথা আছে।"[৭]

প্রকৃতপক্ষে 'দেবযান' শব্দটিই উপনিষদ থেকে নেওয়া হয়েছে। যেমন মরণোত্তর লোকে প্রাণীদের গতি সম্পর্কে *কৌষীতকী উপনিষদ*-এ বলা হয়েছে —

> "স হোবাচ যে বৈ কে চাল্মাল্লোকাৎ প্রযন্তি চন্দ্রমসমেব তে সর্বে গচ্ছন্তি। তেষাং প্রাণৈঃ পূর্বপক্ষ আপ্যায়তে, তানপরপক্ষে ন প্রজনয়তি। এতদ্ বৈ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারং যশ্চন্দ্রমাঃ। তং যঃ প্রত্যাহ তমতিসৃজতে। অথ য এনং ন প্রত্যাহ তমিহ বৃষ্টির্ভূত্বা বর্ষতি। স ইহ কীটো বা পতঙ্গো বা শকুর্নিরা বা শার্দুলো বা সিঙ্ঘো বা মৎস্যো বা পরশ্বা বা পুরুষো বাহন্যো বৈতেষু স্থানেষু প্রত্যাজায়তে যথাকর্ম যথাবিদ্যম্।"[৮]

অর্থাৎ চিত্রা বললেন, — যারা এই লোক হতে চলে যায় তারা সকলেই চন্দ্রলোকে যায়। চন্দ্রই স্বর্গলোকের দ্বার। যে চন্দ্রলোকে থাকতে অস্বীকার করে তাকে চন্দ্র উচ্চতর লোকে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে পাঠান। যে সেখানে থাকতে অস্বীকার করে তাকে তিনি বৃষ্টির আকারে এই লোকে বর্ষণ করেন। সে নিজের কর্ম ও জ্ঞান অনুসারে কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, ব্যাঘ্র, সিংহ, মৎস্য, সর্প বা মনুষ্য এই সকল দেহ ধারণ করে এই লোকে আবার জন্মগ্রহণ করে। 'দেবযান' উপন্যাসেও দেবতার মুখে যেন এই কথারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

> "অবস্থা অনুসারে জীবের গতি নির্দিষ্ট হয়। যেখানে পাঠালে সে উন্নতি করতে পারবে, তাকে সেখানেই পাঠানো যায়। অনন্ত উন্নতিতে জীবাত্মার অধিকার তিনিই দিয়াছেন, যিনি এই বিশ্ব রচনা করেছেন।"[৯]

উন্নত আত্মা দেবযান পথে বিভিন্ন লোক পরিক্রমার শেষে ব্রহ্মলোকে উত্তীর্ণ হন। পাপ, পুণ্য উভয়ই বিসর্জন দিয়ে তিনি ব্রহ্মের অভিমুখে অগ্রসর হন। "স এতং দেবযানং পন্থানম্ আপদ্য অগ্নিলোকম্ আগচ্ছতি, স বায়ুলোকম্, স আদিত্যলোকম্ স বরুণলোকম্, স ইন্দ্রলোকম্, স প্রজাপতিলোকম্, স ব্রহ্মোলোকম্।"[১০] এবং "তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে ধুনুতে। ...স এষ বিসুকৃতো বিদুষ্কৃতো ব্রহ্মবিদ্বান্ ব্রহ্মৈবাভিপ্রৈতি"[১১] অর্থাৎ এখানে দেবযান পথে প্রথম অগ্নিলোকে, তারপর ক্রমে বায়ুলোকে, আদিত্যলোকে, বরুণলোকে, ইন্দ্রলোকে, প্রজাপতিলোকে এবং অবশেষে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হবার কথা বলা হয়েছে এবং এখানে পাপ-পুণ্য উভয়কেই বিসর্জন দেবার কথা বলা হয়েছে। প্রিয় জ্ঞাতিরা পুণ্য এবং শত্রুরা পাপ গ্রহণ করে। রথে যে যায় সে যেমন রথের চাকাগুলি পর্যবেক্ষণ করে, তেমনই এখানে দিবারাত্র পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি সব দ্বন্দ্বগুলি পর্যবেক্ষণ করার কথা বলা হয়ে থাকে। ব্রহ্মবিদ্ পাপ-পুণ্য হতে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হন। এছাড়াও তিনি এখানে ঈশোপনিষদে জীবের গতির কথা বলা হয়েছে তা উল্লেখ করেছিলেন। দেখা যায় সেখানে বলা হয়েছে — "অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্, যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণ মেনো ভূয়িষ্ঠাং তে নম — উক্তিং বিধেম।।"[১২] অর্থাৎ এখানে অগ্নির দেবতার কাছে মুক্তিলাভের জন্য প্রার্থনা করে বলা হচ্ছে তুমি আমাদের দেবযানে নিয়ে যাও, আমাদের অন্তরের সমস্ত চিন্তা, কৃতকর্ম তুমি জান তাই আমাদের কুটিল পাপ হতে মুক্ত কর এটাই বারবার নমস্কার বচন দ্বারা তার কাছে অর্চনা করা হচ্ছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও জীবের গতি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "অথ যে যজ্ঞেন দানেন তপসা লোকাঞ্জয়ন্তি তে ধূমমভিসংভবন্তি... য এতৌ পন্থানৌ ন বিদুস্তে কীটা পতঙ্গা যদিদন দন্দশূকম।।"[১৩] অর্থাৎ যারা যজ্ঞ, দান ও তপস্যা দ্বারা স্বর্গাদি লোকসমূহ জয় করে তারা মৃত্যুর পর চিতাগ্নির ধূমে গমন করে... যারা উভয় পথের কোনটিতে যায় না তারা কীট, পতঙ্গ ও দংশমশকাদিরূপে জন্মায়, ইত্যাদি। — এই সকল ঔপনিষদিকভাবে ভাবিত হয়েই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বোধহয় লিখেছেন, —

> "উচ্চতর সাধনা মানুষকে দেবযান পথে উচ্চতর লোকে নিয়ে যায়। ... মর্ত্যলোকেরও দূরপারে ব্রহ্মাণ্ডের বহিঃস্থিত যে ব্রহ্মলোক, সেখানে যাঁরা যান ভগবানের সঙ্গে তাঁরা এক হয়ে যান। মানব আবর্তে তাঁরা আর ফিরে আসেন না। ...একেই ভারতবর্ষের ঋষিরা মুক্তি বলেছেন।"[১৪]

দেখা যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'দেবযান' উপন্যাসে পরলোকের কথা যা বলেছেন, তার সব যে উপনিষদ ইত্যাদি স্থান থেকে সরাসরি তত্ত্ব সংগ্রহ করেছিলেন তা নয়। ভারতবর্ষের সাধকরা পরলোক সম্পর্কে যে বিচিত্র কল্পনা করে এসেছিলেন তিনি তা নিজের দৃষ্টি দিয়ে শোধন করে

নিয়েছিলেন। তবে তাঁর মূল ভাবকল্পনা ভারতীয় ভাবাদর্শের সঙ্গে অবিরুদ্ধ। তিনি এই উপন্যাসে পরলোক সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, জনঃ, মহঃ, তপঃ এবং সত্য এই সপ্তলোকের উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন মানুষ কর্ম অনুযায়ী প্রথম তিনটি স্তরে যাতায়াত করে। মৃত্যুর পর ভূর্লোক থেকে ভুবর্লোকে আসে, সেখান থেকে উন্নতি করে স্বর্গলোকে যায়। সেখান থেকে আবার পৃথিবীতে জন্ম হয়, যাকে মানব আবর্ত বলে। ভুবর্লোকের বহু আত্মা পুনর্জন্মের জন্য ঘুরে বেড়ায়। সবাই দেহধারণের সুযোগ পায় না। এই অবস্থাকে প্রেতত্ত্ব বলা হয়। মানব আবর্তের পরে উচ্চতর সাধনা দ্বারা দেবযানে ঊর্ধ্বলোকে যাত্রা করে সেখানে তারা এক কল্পকাল থেকে পরে ব্রহ্মলোকে যারা যায়, তারা ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যায়। মানবআবর্তে আর ফিরে আসে না। একে মুক্তি। ব্রহ্মেরও ঊর্ধ্বে পরব্রহ্মলোক, তারও ঊর্ধ্বে নির্গুণ ব্রহ্মলোক ইত্যাদি স্বীকার করেছেন, এইভাবেই তিনি পরলোক সম্বন্ধে বিস্ময় দেখিয়েছেন এবং তাঁর মত স্বকীয়তায় উজ্জ্বল।

আবার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তগতিতে চিরশ্যামল এই পৃথিবীর রূপ দেখাতে গিয়ে জিতুর মুখ দিয়ে শুনিয়েছেন — "বাসুদেবপুরের মরাগাঙের ভাগাড়ে নতুন ঘাসের ওপর গরুর দল চরে বেড়াচ্ছে।"[১৫] এই স্থান পাঠ করলে *কঠোপনিষদ*-এর একটি স্থানের কথা মনে হয় যেখানে নচিকেতা তার পিতাকে বলছেন মরণশীল মানুষ শষ্যের ন্যায় সময় হলেই মারা যায় আবার শষ্যের মত পুনরায় উৎপন্ন হয়। মানুষ শষ্যের মত জীর্ণ হয়ে মরে যায় আবার শষ্যের মতই জন্মায়। "শস্যমিব মর্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ।"[১৬] এই প্রসঙ্গে তাঁর রচিত 'মুখোশ ও মুখশ্রী' নামক গল্পগ্রন্থের একাদশতম গল্প 'অন্তর্জলি'র কথাও বলা যায়। যেখানে তিনি বলেছেন ডুমুরদহ গঙ্গার ঘাটে বিখ্যাত পাঁচালীকার ও কবিগান রচয়িতা দীনদয়াল চক্রবর্ত্তীকে অন্তর্জলির জন্য আনা হয়েছে। সঙ্গে তাঁর দুই পুত্র দেবীপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ, ভ্রাতুষ্পুত্র রামনিধি, দলের ষষ্ঠী সামন্ত, যদু চাকর আছে। কিছুক্ষণের মধ্যে বহু লোক এসে হাজির। সবাই তাঁর প্রশংসা করছে। কাছারির নায়েব নরহরি জোয়ারদার এসেছেন। তিনি বলছেন ব্যবস্থার যেন কোনোরকম ত্রুটি না থাকে। দেবীপ্রসাদের হাতে একটি খাতা দেখে নরহরি তা দেখতে চান। খাতাটি তিনি দেখলেন শ্যামাসঙ্গীতের খাতা। তিনি দীনদয়াল চক্রবর্ত্তীর প্রচুর প্রশংসা করতে থাকলেন। দেবীপ্রসাদের চোখ থেকে জল পড়তে থাকল। তাই দেখে নরহরি বলতে লাগলেন, "সংসার অনিত্য, চিরদিন বাপ-মা থাকে না।"[১৭] অর্থাৎ এর মাধ্যমেও জগতের অনিত্যতার কথাই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার তিনি তাঁর 'শেষ লেখা' নামক গল্পে লিখেছেন,

> "জাগতিক সুখ দু'দিনের। তার জন্য চিরস্থায়ী সুখকে নষ্ট করবে কেন? ....প্রেম ক্ষণস্থায়ী, অনিত্য, ...যখন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন দেখবে সংসার সুখ তার কাছে অতি তুচ্ছ"[১৮]

অর্থাৎ এই স্থান থেকেও বোঝা যাচ্ছে তিনি এই অনিত্য জগতের পিছনে হয়তো নিত্য কোনো কিছুর সন্ধান লাভ করেছিলেন। তাঁর রচনার এই স্থানগুলো পাঠ করলে বিশেষ করে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের কথাই বার বার মনে হয়। যেখানে জাগতিক বিষয়াদিকে অনিত্য বলা হয়েছে, ব্রহ্মকেই সৎ, নিত্য, অপরিণামী রূপে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ আমরা মিথ্যা বস্তুকেই সত্য বলে মনে করি, অকাম্য বিষয়কেই কামনা করি এবং জীবনে অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করি। কিন্তু সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি বা জ্ঞানলাভই হল জীবনের পরমকাম্য। সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি হলে অপ্রেম, বিচ্ছেদ, হিংসা, দ্বেষ, সংঘাত অন্তর্হিত হয়ে

বিশ্বজনীন সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভূতিভূষণের রচনার কিছু স্থান পাঠ করলে তাঁর এই ধরনের মানসিক চিন্তাধারা উপলব্ধি করতে পারা যায়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দার্শনিক মনস্কতার খুব বেশী পরিচয় পাই তাঁর রচিত শেষ উপন্যাস 'ইছামতী'তে। এই উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে নীলকর সাহেব ও এদেশের ভূস্বামীদের প্রজাদের ওপর অত্যাচারের পাশাপাশি ভবানী ঠাকুরের কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে 'ঈশোপনিষদ'-এর মন্ত্র — "হিরন্ময়েণ পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।"[১৯] অর্থাৎ হে সকলের ভরণপোষণকারী পরমেশ্বর, সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর আপনার শ্রীমুখ জ্যোতির্ময় সূর্য মণ্ডলরূপ পাত্রের দ্বারা আবৃত রয়েছে। আপনার ভক্তিরূপ সত্যধর্মের অনুষ্ঠানকারী আমাকে আপনার রূপ দর্শন করাবার জন্য সেই আবরণকে আপনি সরিয়ে নিন। হিংসা ও হানাহানির পরিবেশের মধ্যেও এটি যেন অমৃতলোকের বাণীরূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রসঙ্গে কঠ, মুণ্ডক, প্রশ্ন ইত্যাদি বিভিন্ন উপনিষদের মূল শ্লোকের মাধ্যমে তিনি আত্মার অবিনশ্বরত্ব ও সর্বতোব্যাপিত প্রতিষ্ঠা করেছেন। আবার অনেক ঔপনিষদিক গূঢ়তত্ত্বকেও সাধারণ কথার মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন — "জগৎ হোলো সেই আনন্দময়ের বিলাস বিভূতি।"২০ এই উক্তির পেছনেও তৈত্তিরীয় উপনিষদের "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ। আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে..."[২১] মন্ত্রের প্রভাবই লক্ষ্য করা যায়। যেখানে বলা হয়েছে আনন্দই ব্রহ্ম, এই আনন্দময় পরমাত্মাই অন্নময়াদি সকলের অন্তরাত্মা। ঐ সমস্ত এঁরই স্থূলরূপ। এইজন্য ঐসবে ব্রহ্মবুদ্ধি হয় এবং ব্রহ্মের আংশিক লক্ষণ লক্ষিত হয়। কিন্তু প্রকৃত লক্ষণ আনন্দেই উপলব্ধ হয়। কারণ এই সমস্ত প্রাণী ঐ আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মা থেকেই সৃষ্টির প্রারম্ভে উৎপন্ন হয়। এসবের আদি কারণ তো তিনিই। আনন্দময়ের আনন্দের লেশমাত্র পেয়েই এই সকল প্রাণী জীবিত। কেউই দুঃখের সঙ্গে বেঁচে থাকতে চায় না। ঐ আনন্দময় পরমাত্মার প্রেরণায় জগতের সমস্ত প্রাণীর সমস্ত চেষ্টা সম্পন্ন হয়ে চলছে। তাঁর শাসনে অবস্থিত সূর্য আদি যদি নিজ কর্ম না করেন তবে এক মুহূর্তেও কোনো প্রাণী জীবিত থাকতে পারে না। সকলের জীবনের আধার হলেন একমাত্র আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাই। এইভাবে এতকিছু তত্ত্বকে তিনি এই উপন্যাসে মাত্র একটি বাক্যের মধ্যে দিয়েই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। আবার দেখা যায় ভবানী শেষ সূর্যের আলোয় স্ত্রী পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে বন্দনা করছেন শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদের মাধ্যমে — "যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্সু, যো বিশ্বং ভুবনং আবিবেশ।/ যঃ ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।।(২/১৭)"[২২] অর্থাৎ যিনি সমস্ত লোকে অন্তর্যামীরূপে প্রবিষ্ট, যিনি ওষধি মধ্যে বিরাজমান এবং যিনি বনস্পতিমধ্যে বিদ্যমান অর্থাৎ যিনি সর্বত্র পরিপূর্ণ — এমন পরমদেব পরমাত্মাকে নস্কার। *শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ*-এর এই শ্লোকটি বিভূতিভূষণের এতই প্রিয় ছিল যে দিনলিপিতেও এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ১৯ মে, ১৯৪৩-এ 'হে অরণ্য কথা কও' নামক দিনলিপিতে তিনি লিখেছেন, — "ঊর্ধ্বমুখে আবৃত্তি করলুম য দেবাগ্নৌ সপ্সু যো বিশ্বভুবনমাবিবেশ"[২৩] বৈদিক ঋষিদের এই কবিতা যেদিন প্রথম রচিত হয়েছিল, দৃশ্যদ্বতী তীরে এমনি বৃষ্টি নেমেছিল। তাঁর পত্নী রমাদেবীও অন্তরঙ্গ স্মৃতিচারণায় স্বামীর প্রিয় এই শ্লোকটির উল্লেখ করেছেন যে তাঁরা দুজনে একত্রিত হয়ে প্রায়ই প্রার্থনা করতেন, স্নানের ঘাটে স্নানের পরে উনি তর্পণ করতেন প্রথমে সংস্কৃততে, পরে বাংলায় — যিনি অগ্নিতে, যিনি জলেতে ইত্যাদি বলে। আবার 'চাঁদের পাহাড়' উপন্যাসেও দেখা যায় তিনি লিখেছেন,

> "ভারতবর্ষের ছেলে শঙ্করের দুই হাত আপনা-আপনি প্রণামের ভঙ্গিতে ললাট স্পর্শ করল। প্রণাম, হে রুদ্রদেব প্রণাম। আপনার তাণ্ডব দেখার সুযোগ দিয়েছেন, এজন্যে

> প্রণাম গ্রহণ করুন, হে দেবতা আপনার এ রূপের কাছে শত হীরক খনি তুচ্ছ হয়ে যায়। আমার সমস্ত কষ্ট সার্থক হল।"[২৪]

এখানেও *শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ*-এর এই মন্ত্রেরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। এছাড়াও তিনি প্রকৃতিকে দুটি রূপেই দেখেছিলেন তাও এখান থেকে বোঝা যায়। তিনি শুধুমাত্র প্রকৃতির স্নিগ্ধ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে থাকতেন তাই নয়, প্রকৃতির ভয়ঙ্কর রূপ দেখেও তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। এর মধ্যে দিয়েই দেবতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গী বহু পূর্বেই বৈদিক সাহিত্যেও লক্ষ্য করা গিয়েছিল। যেমন — *অথর্ববেদ*-এর ভূমি সূক্তে বলা হয়েছিল, "শিলা ভূমিরশ্মা পাংসুঃ সা ভূমিঃ সংধৃতা ধৃতা। তস্যৈ হিরণ্যবক্ষসে পৃথিব্যা অকরং নমঃ।।২৬"[২৫] অর্থাৎ শিলা, মাটি, প্রস্তরখণ্ড, ধূলি এগুলির দ্বারা এই পৃথিবী নির্মিত, কঠিনভাবে গঠিত সেই হিরণ্যবক্ষোযুক্তা পৃথিবীকে আমি প্রণাম করেছি। এইভাবেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাসমূহের নানা স্থানে তাঁর ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়, যা চিরাচরিত ধারণা থেকে ভিন্ন ছিল না।

আবার তিনি 'ইছামতী' উপন্যাসেই লিখেছেন — "এষাবৃতির্ণাম তমোগুণস্য—তমোগুণের শক্তিই আবরণ... মায়ার একটি শক্তিই ভগবানকে দেখতে দিচ্ছে না।"[২৬] এই উপন্যাসে ভবানী বাঁড়ুয্যের সঙ্গে তাঁর গুরুভ্রাতা চৈতন্যভারতী ও রামকানাইয়ের আলাপ-আলোচনায়ও অনেক গভীর প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। চৈতন্যভারতী ভবানীকে বলেছেন,

> "যিনিই সমষ্টিরূপে ঈশ্বর, তিনি ব্যাষ্টিতে কার্যরূপে জীব। অদ্বৈতবেদান্তে বলে সমষ্টিতে বর্তমান যে চৈতন্য তাই হোল কার্য। অর্থাৎ ঈশ্বর কর্তা, জীব কার্য। কিন্তু স্বরূপে উভয়েই এক। কেবল উপাধিতে ভিন্ন। তুমিই তোমার ঈশ্বর। আবার ঈশ্বর কে?"[২৭]

এই স্থানগুলি থেকেও বোঝা যায় বিভূতিভূষণ কিভাবে বেদান্তের গভীরে প্রবেশ করেছিলেন। এরপরে আরো দেখা যায় চৈতন্যভারতী, ভবানীকে 'চিৎসুখী' ও 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' পড়াবেন বলছেন যার থেকে ভবানী বুঝতে পারবেন কী শ্রদ্ধার সঙ্গে সেখানে ব্রহ্মের সন্ধান করা হয়েছে। এছাড়াও এই উপন্যাসে দেখা যায় ভবানী তার শিশুপুত্রকে ভগবানের উপাসনা করতে শেখাচ্ছেন। তিনি বলছেন — "প্রকৃত অদ্বৈতবাদী জীবের আনন্দকে নিজের আনন্দ বলে ভাববে। জীবের দুঃখ নিজের দুঃখ বলে ভাববে।"[২৯] আবার বলেছেন — "আমা ছাড়া নন তিনি"[৩০], আবার কোথাও লিখেছেন, "এই শিশু, এই নদীতীর সেই তত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত জিনিষ।"... "তিনি সর্ব্বত্র? নেই কোথায়?"[৩১] 'ইছামতী' উপন্যাসের এই স্থানগুলি পাঠ করলে মনে হয় অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের মূল তত্ত্বই বলতে চাওয়া হয়েছে। কারণ অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে অদ্বয় ব্রহ্মকেই একমাত্র সত্য রূপে স্বীকার করা হয়েছে, জগৎ ও জগৎশ্রষ্টারূপে ঈশ্বরকে মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্মকে অভিন্ন বলা হয়েছে। তবে জগতের ব্যবহারিক সত্যতাকে ব্যাখ্যা করার জন্যই ঈশ্বরের উল্লেখ করা হয়েছে। অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনে বলা হয়েছে মায়া নামে একটি ভ্রম সৃষ্টিকারী শক্তি আছে। মায়া উপাধি দ্বারা উপহিত ব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বর মায়া শক্তির প্রভাবে জগৎরূপে প্রকাশিত হন, আর বদ্ধজীব তার অজ্ঞান বা অবিদ্যাবশতঃ অর্থাৎ অবিদ্যা বা অজ্ঞান উপাধি দ্বারা সীমিত বলে ব্রহ্মের পরিবর্তে জগতের নানাত্বকে সত্য বলে মনে করে। ঈশ্বরের দিক থেকে যা মায়া, জীবের দিক থেকে তা অবিদ্যা বা অজ্ঞান। কিন্তু সত্যের স্বরূপ উপলব্ধি বা জ্ঞানলাভই হোল জীবনের পরমকাম্য। ব্রহ্ম পরমার্থসহ এই উপলব্ধি হলে ব্রহ্মভিন্ন আর কিছু উপলব্ধ হয় না।

ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছে জড়জগৎ, জীবজগতের কোন ভেদ নেই, এক জীবের সঙ্গে অন্য জীবের কোনো ভেদ নেই। এমন উপলব্ধি হলে সর্ববিষয়েই ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হয়। অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের এই তত্ত্বসমূহই 'ইছামতী' উপন্যাসের নানাস্থানে পরিস্ফূট হয়েছে।

তবে তাঁর লেখা 'অভিযাত্রিক' নামক ভ্রমণকাহিনিতে দেখা যায় তিনি সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টাকে খুঁজতে চেয়ে বলেছেন —

> "ইউনিভার্সকে না বুঝলে তার স্রষ্টার সম্বন্ধে কিছুই বোঝা যাবে না। ভগবানের বিরাট ঐশ্বর্যরূপটা আগে প্রত্যক্ষ করি তারপর তার সম্বন্ধে ভাববো।"[৩২] এখানে যেন বৃহদারণ্যক উপনিষদের কথাই বলা হয়েছে — "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৈঊ তিষ্ঠত এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠত এতস্য বা....।"[৩৩]

অর্থাৎ এই অক্ষর ব্রহ্মের প্রশাসনে চন্দ্র ও সূর্য বিধৃতি হয়ে অবস্থিত আছে ইত্যাদি। আবার 'স্মৃতির রেখা' নামক দিনলিপিতে তিনি লিখেছেন — "অনাহত তুমি যুগ থেকে যুগান্তরে চলেছ।"[৩৪] এর মধ্যে মনে হয় গীতার আত্মতত্ত্বের পরোক্ষ প্রভাব ছিল — "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ নায়ং ভূত্বা হ ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।/ অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।"[৩৫] অর্থাৎ আত্মা কখনোই নতুন উৎপন্ন হন না, কখনও বিনষ্টও হন না। আবার 'স্মৃতির রেখা' নামক দিনলিপিতে তিনি বলেছেন, "সুখ দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু সবই খেলা দু'দিনের... কিন্তু ক'জন... সুখ দুঃখের উর্ধ্বের কথা ভাবে?"[৩৬] প্রকৃতপক্ষে তিনি যেন নিজেকে এই সবকিছুর সঙ্গে একাত্ম করে নিয়েছিলেন। তাঁর জীবনের মন্ত্রই ছিল 'চরৈবতি'[৩৭] আর জাগতিক বস্তুর বিনাশ তাঁর পরিবর্তনের নামান্তর গীতার এই বাণীও যেন তাঁর মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি লিখেছেন — "এরা শাশ্বতসুন্দর ঋতুতে ঋতুতে পুনরাবর্তিত হয়ে নবরূপে ফিরে আসে।"[৩৮] 'রবপ্রশস্তি' নামক প্রবন্ধেও তিনি লিখেছেন, "বিশ্বদেবতার এই অমরকাব্য প্রত্যক্ষ কর, যা কখনো জীর্ণ হয় না, কখনো ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।"[৩৯] অর্থাৎ তাঁর এই সকল রচনার মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় যে তিনি আত্মার নিত্যত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। শরীর নাশ হলে আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি হয়। সুখ, দুঃখ ইত্যাদি তাই আত্মার ধর্ম হতে পারে না, এগুলি অন্তঃকরণের ধর্ম। আমরা ভ্রমবশতঃ এগুলি আত্মার ধর্ম মনে করি। তাই আমাদের উচিত আত্মার এগুলি পুনরাবর্তিত বা নবরূপের কথাই চিন্তা করা।

এইভাবেই দেখা যায় উপনিষদ, বেদান্ত, গীতা ইত্যাদির প্রভাব তাঁর জীবনের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল যে তাঁর রচনাবলীর মধ্যেও বিভিন্ন স্থানে তা প্রায়ই পরিস্ফূট হয়ে উঠেছিল। যদি তাঁর মধ্যে কিছুমাত্র দার্শনিকবোধ না থাকত তবে তিনি দর্শনের এইসব কঠিন স্থান এত সহজভাবে ব্যক্ত করতে পারতেন বলে মনে হয় না।

সূত্র নির্দেশ:

১. শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—*বিভূতি রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, অপরাজিত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা — ১২, ১৩৭৯, পৃ. ৮৬।
২. শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—*বিভূতি রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পথের পাঁচালী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা — ১২, ১৩৮১, পৃ. ৯৩-৯৪।

৩. শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—*বিভূতি রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, অপরাজিত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা — ১২, ১৩৭৯, পৃ. ১৮২।
৪. শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—*বিভূতি রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, পত্র, কল্যাণী দেবী, ২৪/১১/১৯৪০।
৫. শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—*বিভূতি রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, দেবযান, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা — ১২, ১৯৭৮, পৃ. ১১-১৩।
৬. শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—*বিভূতি রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, দেবযান, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা — ১২, ১৯৭৮, পৃ. ১১-১৩।
৭. শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, *বিভূতি রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা — ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ভাদ্র ১৪০৪, পৃ. ৬৭৮।
৮. অতুল চন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত — *উপনিষদ* (অখণ্ড), হরফ, কলিকাতা - ১৯৮৬, কৌষীতকী উপনিষদ — ১/২, পৃ. ৮৮৭।
৯. শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—*বিভূতি রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, দেবযান, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা — ১২, ১৩৭৮, পৃ. ১২৬।
১০. অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত — *উপনিষদ* (অখণ্ড), হরফ, কলিকাতা — ০৭, ১৯৮৬, কৌষীতকী উপনিষদ ১/৩, পৃ. ৮৮৯।
১১. ঐ, ১/৪, পৃ. ৮৯০।
১২. অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত — (অখণ্ড) *উপনিষদ*, হরফ, কলিকাতা — ০৭, ১৯৮৬, ঈশোপনিষদ, ১৮, পৃ. ২৯।
১৩. অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত — *বৃহদারণ্যক উপনিষদ*, ৬/২/১৬ হরফ, কলিকাতা — ০৭, পৃ. ৮৫৯।
১৪. শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—*বিভূতি রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, দেবযান, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা — ১২, ১৩৭৮, পৃ. ১০৪।
১৫. ঐ, নবমখণ্ড, দৃষ্টিপ্রদীপ, পৃ. ৫৪।
১৬. অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত —*উপনিষদ* (অখণ্ড), হরফ, কলিকাতা — ০৭, ১৯৮৬, *কঠোপনিষদ* — ১/১/৬, পৃ. ৬৭।
১৭. শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় — *বিভূতি রচনাবলী*, দশম খণ্ড, মুখোশ ও মুখশ্রী — অন্তর্জলি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলিকাতা — ১২, ১৩৭৯, পৃ. ১৮৩।
১৮. ঐ, একাদশ খণ্ড, কুশল পাহাড়ী — শেষ লেখা, পৃ. ৪৬১।
১৯. ঐ, দ্বাদশ খণ্ড, ইছামতী, পৃ. ৯৬।
২০. ঐ, পৃ. ১৯৩।
২১. অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত —*উপনিষদ* (অখণ্ড), হরফ, কলিকাতা — ০৭, ১৯৮৬, তৈত্তীরীয় উপনিষদ — ৩/৬/১, পৃ. ৩১৩।
২২. শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় — *বিভূতি রচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড, ইছামতি, পৃ. ২২৩।
২৩. ঐ, সপ্তম খণ্ড, হে অরণ্য কথা কও, পৃ. ৪০৮।
২৪. ঐ, নবম খণ্ড, চাঁদের পাহাড়, পৃ. ৯৪।

২৫. শ্রী বিজন বিহারী গোস্বামী (অনুবাদ ও সম্পাদনা) — *অথর্ববেদ সংহিতা*, হরফ, কলিকাতা - ০৭, ১৪২১, দ্বাদশ খণ্ড, প্রথম অনুবাদ, প্রথম সূক্ত, পৃ. ৩০৮।
২৭. ঐ, পৃ. ৫৮।
২৮. ঐ, পৃ. ২৩৬।
২৯. ঐ, পৃ. ২৩৮।
৩০. ঐ, পৃ. ২২৪।
৩১. ঐ, পৃ. ২২৮।
৩২. ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, অভিযাত্রিক (ভ্রমণকাহিনী), পৃ. ৪০৯।
৩৩. অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত —*উপনিষদ* (অখণ্ড), হরফ, কলিকাতা — ০৭, ১৯৮৬, বৃহদারণ্যক উপনিষদ — ৩/৮/৯, পৃ. ৭৭০।
৩৪. শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় — *বিভূতি রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, স্মৃতির রেখা, পৃ. ৩৫৫।
৩৫. অতুলচন্দ্র সেন — *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৫, ২/২০, পৃ. ৫৪।
৩৬. শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় — *বিভূতি রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, স্মৃতির রেখা, পৃ. ৩৬৪।
৩৭. ঐ, সপ্তম খণ্ড, হে অরণ্য কথা কও, পৃ. ৪০৯।
৩৮. ঐ, পৃ. ৪৭৫।
৩৯. ঐ, দ্বাদশ খণ্ড, রবিপ্রশস্তি (প্রবন্ধ), পৃ. ৩৫৩।